سورة المجادلة

সূরা মুজাদালা

মদীনায় অবতীর্ণঃ ২২ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللهِ ۖ
وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ اِنَّ اللهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝١ اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ
مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۖ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ۚ وَاِنَّهُمْ
لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۖ وَاِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝٢ وَالَّذِيْنَ
يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ
قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۖ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٣
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ
لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۚ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ ۖ وَتِلْكَ
حُدُوْدُ اللهِ ۖ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٤ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ
كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۖ وَلِلْكٰفِرِيْنَ
عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝٥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۖ
اَحْصٰىهُ اللهُ وَنَسُوْهُ ۖ وَاللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝٦

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহ্‌র

কাছে অভিযোগ করছে, আল্লাহ্ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ্ আপনাদের উভয়ের কথা-বার্তা শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (২) তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (৩) যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফ্ফারা এই ঃ একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দেবে। এটা তোমাদের জন্য উপদেশ হবে। আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর। (৪) যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। এটা এজন্য, যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৫) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা অপদস্থ হয়েছে, যেমন অপদস্থ হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীরা। আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (৬) সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দেবেন, যা তারা করত। আল্লাহ্ তার হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত আছে সব বস্তু।

অবতরণের হেতু ঃ একটি বিশেষ ঘটনা এই সূরার প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত অবতরণের হেতু। হযরত আউস ইবনে সামেত (রা) একবার তাঁর স্ত্রী খাওলাকে বলে দিলেন ঃ انت على كظهر امى অর্থাৎ তুমি আমার পক্ষে আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের ন্যায় ; মানে হারাম। ইসলাম-পূর্বকালে এই বাক্যটি চিরতরে হারাম করার জন্য স্ত্রীকে বলা হত, যা চূড়ান্ত তালাক অপেক্ষাও কঠোরতর। এই ঘটনার পর হযরত খাওলা (রা) শরীয়তসম্মত বিধান জানার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। তখন পর্যন্ত এই বিষয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তাই তিনি পূর্ব থেকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী খাওলাকে বলে দিলেন ঃ ما اراك الا قد حرمت عليه অর্থাৎ আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছ। খাওলা একথা শুনে বিলাপ শুরু করে দিলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার যৌবন তার কাছে নিঃশেষ করেছি। এখন বার্ধক্যে সে আমার সাথে এই ব্যবহার করল। আমি কোথায় যাব। আমার ও আমার বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ কিরূপে হবে। এক রেওয়ায়েতে খাওলার এ উক্তিও বর্ণিত আছে ঃ ما ذكر طلاقا অর্থাৎ আমার স্বামী তো তালাক উচ্চারণ করেনি। এমতাবস্থায় তালাক কিরূপে হয়ে গেল? অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, খাওলা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করলেন ঃ اللهم انى اشكوا اليك অর্থাৎ আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে অভিযোগ করছি। এক রেওয়ায়েতে আছে রসূলুল্লাহ্ (সা) খাওলাকে একথা বললেন ঃ

ما امرت فى شانك بشئى حتى الان অর্থাৎ তোমার মাস'আলা সম্পর্কে আমার প্রতি এখন পর্যন্ত কোন বিধান অবতীর্ণ হয়নি (এসব রেওয়ায়েতে কোন বৈপরীত্য নেই। সবগুলোই সঠিক হতে পারে)। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। ---(দুররে-মনসূর, ইবনে কাসীর) ফিকহ্‌র পরিভাষায় এই বিশেষ মাস'আলাটিকে 'জিহার' বলা হয়। এই সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহে জিহারের শরীয়তসম্মত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত খাওলা (রা)-র ফরিয়াদ শুনে তার জন্য তার সমস্যা সহজ করে দিয়েছেন। তার খাতিরে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকে এসব আয়াত নাযিল করেছেন। তাই সাহাবায়ে কিরাম এই মহিলার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। একদিন খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা) একদল লোকের সাথে গমনরত ছিলেন। পথিমধ্যে এই মহিলা সামনে এসে দণ্ডায়মান হলে তিনি দাঁড়িয়ে তার কথাবার্তা শুনলেন। কেউ কেউ বলল ঃ আপনি এই বৃদ্ধার খাতিরে এতবড় দলকে পথে আটকিয়ে রাখলেন। খলীফা বললেন ঃ জান ইনি কে? এ সেই মহিলা, যার কথা আল্লাহ্ তা'আলা সপ্ত আকাশের উপরে শুনেছেন। অতএব আমি কি তাঁর কথা এড়িয়ে যেতে পারি? আল্লাহ্‌র কসম, তিনি যদি স্বেচ্ছায় প্রস্থান না করতেন, তবে আমি রাত্রি পর্যন্ত তাঁর সাথে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতাম।---(ইবনে কাসীর)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে নারী তার স্বামী সম্পর্কে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল (এবং বলছিল ঃ ما ذكر طلاقا অর্থাৎ সে তো তালাক উচ্চারণ করেনি। অতএব আমি কিরূপে হারাম হয়ে গেলাম?) এবং (নিজের দুঃখ ও কষ্টের জন্য) আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করছিল (এবং বলছিল ঃ اللهم انى اشكوا اليك) আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ্ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (অতএব তার কথা শুনবেন না কেন? 'আল্লাহ্ শুনেছেন' কথার উদ্দেশ্য এই নারীর দুঃখ-কষ্ট দূর করা এবং তার অক্ষমতা মেনে নেওয়া আল্লাহ্‌র জন্য শ্রবণ সপ্রমাণ করা নয়)। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণের সাথে জিহার করে (এবং انت على كظهر امى বলে দেয়) সেই স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। (তাই এই কথা বলার কারণে এই মহিলারা তাদের মাতা হয়ে যায়নি যে, চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। চিরতরে হারাম হওয়ার অন্য কোন দলীলভিত্তিক কারণও নেই। অতএব তারা চিরতরে হারাম হবে না)। তারা (অর্থাৎ যারা স্ত্রীগণকে মাতা বলে দেয়) নিঃসন্দেহে অসঙ্গত ও মিথ্যা কথাই বলে। (তাই পাপ অবশ্যই হবে। এই পাপের ক্ষতিপূরণ করে দিলে তা মাফও হয়ে যাবে। কেননা) আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। (অতঃপর এই ক্ষতিপূরণের কতক উপায় বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) যারা তাদের স্ত্রীগণের সাথে জিহার করে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে (অর্থাৎ স্ত্রী হারাম হোক এটা চায় না) তাদের কাফ্‌ফারা এই ঃ (স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে) একে অপরকে

স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্ত করতে হবে। এটা (অর্থাৎ কাফ্ফারার বিধান) তোমাদের জন্য উপদেশ হবে; (কাফ্ফারা দ্বারা গোনাহ্ মার্জনা ছাড়া এই উপকারও হবে যে, ভবিষ্যতের জন্য তোমরা সতর্ক হবে। আল্লাহ্ তোমাদের সব ক্রিয়াকর্মের খবর রাখেন। (অর্থাৎ কাফ্ফারা সম্পর্কিত আদেশ তোমরা পুরোপুরি পালন কর কিনা, তা তিনি জানেন। সুতরাং কাফ্ফারার রহস্য দুটি। এক. পাপ মার্জনা, যার প্রতি لَعَفُوٌّ غَفُورٌ এ ইঙ্গিত আছে, দুই. সতর্ককরণ, যা تُوعَظُونَ বাক্যে বিধৃত হয়েছে। তিন প্রকার কাফ্ফারার মধ্যেই এই দ্বিতীয় রহস্য নিহিত আছে। কিন্তু দাস মুক্ত করাকে প্রথমে উল্লেখ করার কারণে একে এর সাথে বলে দেওয়া হয়েছে)। যার এ সামর্থ্য নেই (অর্থাৎ দাস মুক্ত করতে সক্ষম নয়) সে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে (স্বামী-স্ত্রী উভয়ে) পরস্পরে মেলামেশা করার পূর্বে। অতঃপর যে এতেও অক্ষম সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। (অতঃপর এই বিধান যে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে। কারণ, এই বিধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মূর্খতা যুগের প্রাচীন প্রথাকে উচ্ছেদ করা। তাই ইরশাদ হচ্ছেঃ) এটা এজন্য (বর্ণিত হয়েছে), যাতে (এই বিধান সম্পর্কিত উপযোগিতাসমূহ অর্জন করা ছাড়াও) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর (অর্থাৎ এই বিধানের ব্যাপারে তাঁদেরকে সত্যবাদী মনে কর। অতঃপর আরও তাকীদ করার জন্য ইরশাদ হচ্ছেঃ) এগুলো আল্লাহ্র (নির্ধারিত) সীমা (অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধি)। কাফিরদের জন্য (যারা এসব বিধান মানে না) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (যারা আদেশ পালনে ত্রুটি করে, তাদের জন্যও সাধারণ শাস্তি হতে পারে। শুধু এই বিধানেরই বিশেষত্ব নেই; বরং) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে যে কোন বিধানে করুক, যেমন মক্কার কাফির সম্প্রদায়) তারা (দুনিয়াতেও) লাঞ্ছিত হবে, যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা লাঞ্ছিত হয়েছে। (সেমতে একাধিক যুদ্ধে এটা হয়েছে। শাস্তি কেন হবে না? কারণ) আমি সুস্পষ্ট বিধানাবলী অবতীর্ণ করেছি। (অতএব এগুলো না মানা অবশ্যই শাস্তির কারণ। এ শাস্তি দুনিয়াতে হবে) আর কাফিরদের জন্য (পরকালেও) অপমানজনক শাস্তি আছে (এই শাস্তি সেদিন হবে) যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তারা করত। আল্লাহ্ তার হিসাব রেখেছেন আর তারা তা ভুলে গেছে (প্রকৃতই কিংবা নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়ার দিক দিয়ে) আল্লাহ্ সব বস্তু সম্পর্কে অবগত। (তাদের ক্রিয়াকর্ম হোক কিংবা অন্য কিছু)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ---পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এসব আয়াতে উল্লিখিত নারী হলেন হযরত আউস ইবনে সামেত (রা)-র স্ত্রী খাওলা বিনতে সা'লাবা। তাঁর স্বামী তাঁর সাথে জিহার করেছিলেন। তিনি এই অভিযোগ নিয়ে রসূল করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সম্মান দান করে জওয়াবে এসব আয়াত নাযিল করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এসব আয়াতে কেবল জিহারের শরীয়তসম্মত বিধান বর্ণনা এবং তাঁর কষ্ট দূর করার ব্যবস্থাই করেন নি; বরং তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য শুরুতেই বলে দিলেনঃ যে নারী তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল, আমি তার কথা শুনেছি। একবার জওয়াব দেওয়া সত্ত্বেও মহিলা বারবার নিজের কষ্ট বর্ণনা করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আয়াতে একেই مجادلة বলা হয়েছে। কতক রেওয়া-য়েতে আরও আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) জওয়াবে খাওলাকে বললেনঃ তোমার ব্যাপারে আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার কোন বিধান নাযিল হয়নি। তখন দুঃখিনীর মুখে একথা উচ্চারিত হলঃ আপনার প্রতি তো প্রত্যেক ব্যাপারে বিধান নাযিল হয়। আমার ব্যাপারে কি হল যে, ওহীও বন্ধ হয়ে গেল।---(কুরতুবী) এরপর খাওলা আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করতে লাগলেন। এর প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাযিল হয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেনঃ সেই সত্তা পবিত্র, যিনি সব আওয়াজ ও প্রত্যেকের আওয়াজ শুনলেন; খাওলা বিনতে সা'লাবা যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমি তার কোন কোন কথা শুনতে পারিনি। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা সব শুনেছেন এবং বলেছেনঃ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ----(বুখারী, ইবনে কাসীর)

اَلَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَائِهِمْ---يظاهرون শব্দটি ظهار থেকে উদ্ভূত। স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়ার বিশেষ একটি পদ্ধতিকে ظهار বলা হয়। এটা ইসলাম-পূর্বকালে প্রচলিত ছিল। পদ্ধতিটি এইঃ স্বামী স্ত্রীকে বলে দেবে---انت على كظهر امى অর্থাৎ তুমি আমার উপর আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের মত হারাম। এখানে পেটই আসল উদ্দেশ্য, কিন্তু রূপকভঙ্গিতে পৃষ্ঠদেশের উল্লেখ করা হয়েছে। ---(কুরতুবী)

জিহারের সংজ্ঞা ও বিধানঃ শরীয়তের পরিভাষায় জিহারের সংজ্ঞা এইঃ আপন স্ত্রীকে চিরতরে হারাম মাতা, ভগিনী, কন্যা প্রমুখের এমন অঙ্গের সাথে তুলনা করা যা দেখা তার জন্য নাজায়েয। মাতার পৃষ্ঠদেশও এক দৃষ্টান্ত। মূর্খতা যুগে এই বাক্যটি চিরতরে হারাম বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হত এবং তালাক শব্দ অপেক্ষাও গুরুতর মনে করা হত। কারণ তালাকের পর প্রত্যাহার অথবা পুনর্বিবাহের মাধ্যমে আবার স্ত্রী হতে পারে, কিন্তু জিহার করলে মূর্খতা যুগের প্রথা অনুযায়ী তাদের স্বামী-স্ত্রী হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত এই প্রথার দ্বিবিধ সংস্কার সাধন করেছে, প্রথমত স্বয়ং জিহারের প্রথাকেই অবৈধ ও গোনাহ্ সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ কাম্য হলে তার বৈধ পন্থা হচ্ছে তালাক। সেটা অবলম্বন করা

দরকার। জিহারকে এ কাজের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা, স্ত্রীকে মাতা বলে দেওয়া একটা অসার ও মিথ্যা বাক্য। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ অর্থাৎ তাদের এই অসার উক্তির কারণে স্ত্রী মাতা হয়ে যায় না। মাতা তো সে-ই, যার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে ঃ এরপর বলেছে ঃ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا অর্থাৎ তাদের এই উক্তি মিথ্যা এবং পাপও। কারণ, বাস্তব ঘটনার বিপরীতে স্ত্রীকে মাতা বলছে।

দ্বিতীয় সংস্কার এই করেছে যে, যদি কোন মূর্খ অর্বাচীন ব্যক্তি এরূপ করেই বসে, তবে এই বাক্যের কারণে ইসলামী শরীয়তে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না। কিন্তু এই বাক্য বলার পর স্ত্রীকে পূর্ববৎ ভোগ করার অধিকারও তাকে দেওয়া হবে না। বরং তাকে জরি-মানাস্বরূপ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। সে যদি এই উক্তি প্রত্যাহার করতে চায় এবং পূর্বের ন্যায় স্ত্রীকে ব্যবহার করতে চায়, তবে কাফ্ফারা আদায় করে পাপের প্রায়-শ্চিত্ত করবে। কাফ্ফারা আদায় না করলে স্ত্রী হালাল হবে না।

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا আয়াতের অর্থ তাই। এখানে لِمَا قَالُوا শব্দটি عَمَّا قَالُوا শব্দের অর্থে ব্যহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তারা আপন উক্তি প্রত্যাহার করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) يَعُودُونَ শব্দের অর্থ করেন يَنْدَمُونَ---অর্থাৎ একথা বলার পর তারা অনুতপ্ত হয় এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চায়।---(মাযহারী)

এই আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা হালাল হওয়ার উদ্দে-শ্যেই কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে। খোদ জিহার কাফ্ফারার কারণ নয়। বরং জিহার করা এমন গোনাহ্, যার কাফ্ফারা তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আয়াতের শেষে إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই কোন ব্যক্তি যদি জিহার করার পর স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে না চায়, তবে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করা না-জায়েয। স্ত্রী দাবী করলে কাফ্ফারা আদায় করে মেলামেশা করা অথবা তালাক দিয়ে মুক্ত করা ওয়াজিব। স্বামী স্বেচ্ছায় এরূপ না করলে স্ত্রী আদালতে রুজু হয়ে স্বামীকে এরূপ করতে বাধ্য করতে পারে।

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ---অর্থাৎ জিহারের কাফ্ফারা এই যে, একজন দাস অথবা

দাসীকে মুক্ত করবে। এরূপ করতে সক্ষম না হলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। রোগ-ব্যাধি কিংবা দুর্বলতাবশত অতগুলো রোযা রাখতেও সক্ষম না হলে ষাটজন মিসকীনকে দুবেলা পেট ভরে আহার করাবে। আহার করানোর পরিবর্তে ষাটজন মিসকীনকে জন প্রতি একজনের ফিতরা পরিমাণ গম কিংবা তার মূল্য দিলেও চলবে। আমাদের প্রচলিত ওজনে একজনের ফিতরার পরিমাণ হচ্ছে পৌনে দুসের গম।

জিহারের বিস্তারিত বিধান ও কাফ্ফারার মাস'আলা ফিকহ্র কিতাবসমূহে দ্রষ্টব্য।

হাদীসে আছে, খাওলা বিনতে সা'লাবার ফরিয়াদের পরিপ্রেক্ষিতে যখন আলোচ্য আয়াতসমূহে জিহারের বিধান অবতীর্ণ হল তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তার স্বামীকে ডাকলেন। দেখা গেল যে, সে একজন ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন বৃদ্ধ লোক। তিনি তাকে আয়াত ও কাফ্ফারার বিধান শুনিয়ে বললেনঃ একজন দাস অথবা দাসী মুক্ত করে দাও। সে বললঃ একজন দাস ক্রয় করে মুক্ত করার মত আর্থিক সঙ্গতি আমার নেই। তিনি বললেনঃ তা হলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখ। সে বললঃ সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করেছেন---আমার অবস্থা এই যে, আমি দিনে দুতিন বার আহার না করলে দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। তিনি বললেনঃ তা হলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। সে আরয করলঃ আপনি সাহায্য না করলে এরূপ করার সামর্থ্যও আমার নেই। অগত্যা রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে কিছু গম দিলেন এবং অন্যরাও কিছু গম চাঁদা তুলে এনে দিল। এভাবে ষাটজন মিসকীনকে ফিতরার পরিমাণে গম দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করা হলো।---(ইবনে কাসীর)

ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ---এই আয়াতে ঈমান বলে শরীয়ত ও বিধানাবলী পালন বোঝানো হয়েছে। বলা হয়েছেঃ কাফ্ফারা ইত্যাদির বিধান আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। এই সীমা ডিঙানো হারাম। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইসলাম বিবাহ, তালাক, জিহার ও অন্যান্য সব ব্যাপারে মূর্খতা যুগের প্রথা-পদ্ধতি বিলোপ করে সুষম ও বিশুদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা এগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। যারা এসব সীমা মানে না তথা কাফির, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ---পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্র সীমা ও ইসলামের বিধানাবলী পালন করার তাকীদ ছিল। এই আয়াতে বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এতে পার্থিব লাঞ্ছনা ঐ উদ্দেশ্যে ব্যর্থতা এবং পরকালে কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ---এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, মানুষ দুনিয়াতে

পাপাচার করে যায় এবং তা তার স্মরণও থাকে না। স্মরণ না থাকার কারণ হচ্ছে একে মোটেই গুরুত্ব না দেওয়া। কিন্তু তার সব পাপাচার আল্লাহ্‌র কাছে লিখিত আছে। আল্লাহ্ তা'আলার সব স্মরণ আছে। এজন্য আযাব হবে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَّجْوٰى
ثَلٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ
وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ
يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ
وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ
لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○
يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنٰجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنٰجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○ إِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○
يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○ يٰأَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نٰجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ
صَدَقَةً ذٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيْمٌ ۝ ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ

تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ

وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

(৭) আপনি কি ভেবে দেখেন নি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ্ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচজনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন, তারা যা করে তিনি কিয়ামতের দিন তা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (৮) আপনি কি ভেবে দেখেন নি, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, সীমালংঘন এবং রসূলের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাঘুষা করে। তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম করে, যদ্দ্বারা আল্লাহ্ আপনাকে সালাম করেন নি। তারা মনে মনে বলেঃ আমরা যা বলি, তজ্জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। কত নিকৃষ্ট সেই জায়গা! (৯) হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কানাকানি কর, তখন পাপাচার, সীমালংঘন ও রসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না এবং অনুগ্রহ ও আল্লাহ্‌ভীতির ব্যাপারে কানাকানি করো। আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার কাছে তোমরা একত্রিত হবে। (১০) এই কানাঘুষা তো শয়তানের কাজ; মু'মিনদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য। তবে আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মু'মিনদের উচিত আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। (১১) হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়ঃ মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দেবেন। যখন বলা হয়ঃ উঠে যাও তখন উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর। (১২) হে মু'মিনগণ! তোমরা রসূলের কাছে কানকথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদ্‌কা প্রদান করবে। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পবিত্র হওয়ার ভাল উপায়। যদি তাতে সক্ষম না হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৩) তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদ্‌কা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে? অতঃপর তোমরা যখন সদ্‌কা দিতে পারলে না এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন তখন তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর।

শানে-নুযূলঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ কয়েকটি ঘটনা। এক. ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তিচুক্তি ছিল। কিন্তু ইহুদীরা যখন কোন মুসলমানকে

দেখত, তখন তার চিন্তাধারাকে বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে পরস্পরে কানাকানি শুরু করে দিত। মুসলমান ব্যক্তি মনে করত যে, তার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করা হচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) ইহুদীদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা বিরত হল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ الخ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

দুই. মুনাফিকরাও এমনিভাবে পরস্পরে কানাকানি করত। এর পরিপ্রেক্ষিতে إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا আয়াত নাযিল হয়। তিন. ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলে দুষ্টুমির ছলে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার পরিবর্তে اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ বলত। سام শব্দের অর্থ মৃত্যু। চার. মুনাফিকরাও এমনিভাবে বলত। উভয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে وَإِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ الخ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইবনে কাসীর ইমাম আহমদ (র) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, ইহুদীরা এভাবে সালাম করে চুপিসারে বলত ঃ

لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ—অর্থাৎ আমাদের এই গোনাহের কারণে আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? পাঁচ. একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) সুফ্‌ফা মসজিদে অবস্থানরত ছিলেন। মসজিদে অনেক লোক সমাগম ছিল। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থান পেলেন না। মজলিসের লোকজনও চেপে চেপে বসে স্থান করে দিল না। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই নির্বিকার দৃশ্য দেখে কয়েকজন লোককে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ দিলেন। মুনাফিকরা 'এটা কেমন ইনসাফ' বলে আপত্তি জানাল। রসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বললেন ঃ আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন, যে আপন ভাইয়ের জন্য জায়গা খালি করে দেয়। এরপর লোকেরা জায়গা খালি করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قِيْلَ لَكُمْ الخ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

---(ইবনে কাসীর) রেওয়ায়েতের সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে জায়গা খালি করে দেওয়ার কথা বলে থাকবেন। কেউ কেউ খালি করে দিল, যা পর্যাপ্ত ছিল না এবং কেউ কেউ খালি করল না। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে উঠে যেতে বলেছেন, যা মুনাফিকদের মনঃপূত হয়নি। ছয়. কোন কোন বিত্তশালী লোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কানকথা বলত। ফলে নিঃস্ব মুসলমানগণ কথাবার্তা বলে উপকৃত হওয়ার সময় কম পেত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছেও ধনীদের দীর্ঘক্ষণ বসে কানকথা অপছন্দনীয় ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ الخ

আয়াত অবতীর্ণ হয়। ফতহুল-বয়ানে বর্ণিত আছেঃ ইহুদী ও মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে অনাবশ্যক কানকথা বলত। মুসলমানগণ কোন ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে কানকথা হচ্ছে ধারণা করে তা পছন্দ করত না। ফলে তাদেরকে নিষেধ করা হয়, যা نُهُوا عَنْهُ বাক্যে বিধৃত হয়েছে। কিন্তু যখন তারা বিরত হল না, তখন إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ الخ আয়াত অবতীর্ণ হল। এর ফলশ্রুতিতে বাতিলপন্থীরা কানাকানি করা থেকে বিরত হয়। কারণ, অর্থ প্রীতির কারণে সদ্‌কা প্রদান করা তাদের জন্য কষ্টকর ছিল।

সাত. যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করার আদেশ হল, তখন অনেকে জরুরী কথাও বন্ধ করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ءَأَشْفَقْتُمْ الخ আয়াত নাযিল হল। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেনঃ সদ্‌কা প্রদান করার আদেশে পূর্ব থেকেও فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا আয়াতে অসমর্থ লোকদের বেলায় আদেশ শিথিল করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুসংখ্যক লোক সম্পূর্ণ অসমর্থও ছিল না এবং পুরোপুরি বিত্তশালীও ছিল না। কম সামর্থ্য এবং অক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহের কারণে সম্ভবত তাদের জন্যই সদ্‌কা প্রদান করা কষ্টকর হয়েছিল। তাই তারা সদ্‌কা প্রদান করতে পারেনি এবং নিজেদেরকে আদেশের আওতা-বহির্ভূতও মনে করেনি। আর কানকথা বলা ইবাদতও ছিল না যে, এটা ত্যাগ করলে নিন্দার পাত্র হয়ে যাবে। তাই তারা কানকথা বলা বন্ধ করেছিল।---(সবগুলো রেওয়ায়েতই দুররে-মনসূরে বর্ণিত আছে)। অবতরণের এসব হেতু জানার ফলে আয়াতসমূহের তফসীর বোঝা সহজ হবে।---(বয়ানুল-কোরআন)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি এ বিষয়ে ভেবে দেখেন নি (নিষিদ্ধ কানাঘুষা থেকে যারা বিরত হত না, এখানে তাদেরকে শোনানোই উদ্দেশ্য) যে, আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের সবকিছু জানেন। (তাদের কানাকানিও এই 'সবকিছু'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত)। তিন ব্যক্তির এমন কোন কানাকানি হয় না, যাতে তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম (যেমন দুই অথবা চারজন) হোক বা বেশী (যেমন ছয় অথবা সাতজন) হোক, তিনি (সর্বাবস্থায়) তাদের সাথে থাকেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর তারা যা করে তিনি কিয়ামতের দিন তা তাদেরকে বলে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (এই আয়াতের বিষয়বস্তু সামগ্রিকভাবে পরবর্তী খুঁটিনাটি বিষয়বস্তুর ভূমিকা। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে যারা মিথ্যা কানাকানি করে তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে না। আল্লাহ্ সব খবর রাখেন এবং তাদেরকে শাস্তি দেবেন। অতঃপর খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু বর্ণিত হচ্ছেঃ) আপনি কি তাদের বিষয় ভেবে দেখেন নি এবং তাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা

হয়েছিল, অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, জুলুম ও রসূলের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাকানি করে। (অর্থাৎ তাদের কানাকানি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে গোনাহ্ এবং মুসলমানদেরকে দুঃখিত করার উদ্দেশ্য থাকার কারণে জুলুম এবং রসূলের নিষেধ করার কারণে রসূলের অবাধ্যতাও; যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে)। তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম করে যদ্দ্বারা আল্লাহ্ আপনাকে সালাম করেন নি। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ভাষা তো এরূপঃ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى এবং صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا আর তারা বলেঃ اَلسَّامُ عَلَيْكَ অর্থাৎ আপনার মৃত্যু হোক) তারা মনে মনে (অথবা পরস্পরে) বলেঃ (সে পয়গম্বর হলে) আমরা যা বলি (যাতে তার প্রতি পরিষ্কার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হয়) তজ্জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে (তাৎ-ক্ষণিক) শাস্তি দেন না কেন? (তৃতীয় ও চতুর্থ ঘটনায় এর বর্ণনা আছে। অতঃপর তাদের এই দুষ্কর্মের জন্য শাস্তিবাণী এবং এই উক্তির জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে, কোন কোন রহস্যের কারণে তাৎক্ষণিক শাস্তি না হলে সর্বাবস্থায় শাস্তি না হওয়া জরুরী হয় না)। জাহান্নাম তাদের জন্য যথেষ্ট (শাস্তি)। তারা তাতে (অবশ্যই) প্রবেশ করবে। কত নিকৃষ্ট সেই ঠিকানা! (অতঃপর মু'মিনগণকে সম্বোধন করা হচ্ছে। এতে মুনাফিকদের অনুরূপ কাজ করতে তাদেরকেও নিষেধ করা হয়েছে এবং মুনাফিকদেরকেও একথা বলা উদ্দেশ্য যে, তোমরা মুখে ঈমান দাবী কর, অতএব ঈমান অনুযায়ী কাজ করা তোমাদের উচিত। ইরশাদ হয়েছেঃ) মু'মিনগণ, যখন তোমরা (কোন প্রয়োজনে) কানাকানি কর তখন পাপাচার, সীমালংঘন ও রসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না এবং অনুগ্রহ ও আল্লাহ্ভীতির বিষয়ে কানাকানি কর। (بر শব্দটি عدوان--এর বিপরীত। এর অর্থ অনুগ্রহ, যার উপকার অন্যে পায়। تقوى শব্দটি اثم ও معصية الرسول অর্থাৎ রসূলের অবাধ্যতার বিপরীত)। আল্লাহ্কে ভয় কর যার কাছে তোমরা সমবেত হবে এই কানাকানি তো কেবল শয়তানের (প্ররোচনামূলক) কাজ, মু'মিনদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য (যেমন প্রথম ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে)। তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত যে তাদের (মুসলমান-দের) কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (এটা মুসলমানদের জন্য সান্ত্বনা। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যদি শয়তানের প্ররোচনায় তোমাদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করেও তবুও আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। অতএব চিন্তা কিসের?) মু'মিনদের উচিত (প্রত্যেক কর্মে) আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা। (অতঃপর পঞ্চম ঘটনা অর্থাৎ মজলিসে কিছু লোক পরে আগমন করলে তাদের জন্য জায়গা খালি করে দেওয়ার আদেশ বর্ণিত হচ্ছেঃ) মু'মিনগণ, যখন তোমাদেরকে বলা হয়ঃ [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন অথবা পদস্থ ও গণ্যমান্য লোকগণ বলেন] মজলিসে জায়গা করে দাও (যাতে পরে আগমনকারীও জায়গা পায়), তখন তোমরা জায়গা করে দিও; আল্লাহ্ তোমাদেরকে (জান্নাতে) প্রশস্ত জায়গা দেবেন।

যখন (কোন প্রয়োজনে) বলা হয়ঃ (মজলিস থেকে) উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো (তা আগমনকারীকে জায়গা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হোক কিংবা সভাপতির কোন বিশেষ পরামর্শ, আরাম কিংবা ইবাদত ইত্যাদির কারণে নির্জনতার প্রয়োজনে বলা হোক, যা নির্জনতা ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না বা পূর্ণ হতে পারে না। মোটকথা, সভাপতির আদেশ হলে উঠে যাওয়া উচিত। রসূল নয়---এমন ব্যক্তির বেলায়ও এই নির্দেশ ব্যাপক। সুতরাং প্রয়োজনের সময় কাউকে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ জারি করার অধিকার সভাপতির আছে। তবে যে ব্যক্তি পরে মজলিসে আসে, তার এরূপ অধিকার নেই যে, কাউকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসে যাবে। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে তাই বর্ণিত আছে। মোট কথা, আয়াতে সভাপতির আদেশে উঠে যাওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে)। আল্লাহ্ তা'আলা (এই বিধান পালনের কারণে) তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং (তাদের মধ্যে যারা ধর্মের) জ্ঞানপ্রাপ্ত, তাদের (পারলৌকিক) মর্যাদা (আরও অধিক) উচ্চ করে দেবেন। (অর্থাৎ এই বিধান পালনকারিগণ তিন প্রকার। এক. কাফির---যারা পার্থিব উপকারার্থে মেনে নেবে; যেমন মুনাফিকরাও তাই করবে। منكم শব্দের কারণে তারা এই ওয়াদার আওতা থেকে বের হয়ে গেছে। দুই. জ্ঞানপ্রাপ্ত নয়, এমন মু'মিনগণ। তাদের মর্যাদাই কেবল উচ্চ করা হবে। তিন. জ্ঞানপ্রাপ্ত মু'মিনগণ, তাদের মর্যাদা আরও অধিক উচ্চ করা হবে। কেননা, জ্ঞানের কারণে তাদের কর্ম অধিক ভীতিপূর্ণ ও অধিক আন্তরিক। এর ফলে কর্মের সওয়াব বেড়ে যায়)। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কর্মের খবর রাখেন। (অর্থাৎ কার কর্ম ঈমানসহ এবং কার কর্ম ঈমান ব্যতীত; কার কর্মে আন্তরিকতা কম এবং কার কর্মে আন্তরিকতা বেশী, তা সবই তিনি জানেন। তাই প্রত্যেকের প্রতিদানে পার্থক্য রেখেছেন। অতঃপর প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটনার সাথে সংযুক্ত ষষ্ঠ ঘটনা সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ) মু'মিনগণ, তোমরা যখন রসূলের কাছে কানকথা বলতে চাও, তখন কানকথা বলার পূর্বে কিছু সদ্‌কা (ফকীর-মিসকীনকে) প্রদান করবে। (এর পরিমাণ আয়াতে উল্লেখ নেই। হাদীসে বিভিন্ন পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যত পরিমাণ অনির্দিষ্ট হলেও তা উল্লেখযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়)। এটা তোমাদের জন্য (সওয়াব হাসিল করার উদ্দেশ্যে) শ্রেয়ঃ এবং (গোনাহ্ থেকে) পবিত্র হওয়ার ভাল উপায়। (কেননা, ইবাদত গোনাহের কাফ্‌ফারা হয়ে থাকে। বিত্তশালী মু'মিনদের বেলায় এই উপকারিতা। নিঃস্ব মু'মিনদের বেলায় উপযোগিতা এই যে, তারা আর্থিক উপকার লাভ করবে। 'সদ্‌কা' শব্দ থেকে তা জানা যায়। কেননা, সদ্‌কা নিঃস্বদের খাতেই ব্যয়িত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বেলায় উপযোগিতা এই যে, এতে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি আছে এবং মুনাফিকদের কানাকানির ফলে তিনি যে কষ্ট অনুভব করতেন, তা থেকে মুক্তি আছে। কেননা, কানাকানির প্রয়োজন তাদের ছিল না; অতএব বিনা-প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করা তাদের জন্য কষ্টকর ছিল। সম্ভবত প্রকাশ্যে সদ্‌কা করার আদেশ ছিল, যাতে সদ্‌কা প্রদান না করে কেউ ধোঁকা দিতে সক্ষম না হয়। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, এই আদেশ সামর্থ্যবানদের জন্যঃ) অতঃপর যদি তোমরা সদ্‌কা প্রদান করতে সক্ষম না হও, (এবং কানাকানির প্রয়োজন থাকে) তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (তিনি তোমাদেরকে মাফ করবেন। এ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, আদেশটি ওয়াজিব ছিল, কিন্তু অক্ষমতার অবস্থা ব্যতিক্রমভুক্ত ছিল। অতঃপর ষষ্ঠ ঘটনার সাথে সংযুক্ত সপ্তম ঘটনা

সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে ঃ) তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদ্কা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে ? তোমরা যখন তা পারলে না এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন, (আদেশটি সম্পূর্ণ রহিত করে মাফ করে দিলেন। কারণ, যে উপযোগিতার কারণে আদেশটি ওয়াজিব হয়েছিল, তা অর্জিত হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ্ যখন মাফ করে দিলেন) তখন তোমরা (অন্যান্য ইবাদত পালন কর ; অর্থাৎ) নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর। (উদ্দেশ্য এই যে, এই আদেশ রহিত হওয়ার পর তোমাদের নৈকট্য লাভ ও মুক্তির জন্য অন্যান্য বিধান পালনে দৃঢ়তা প্রদর্শনই যথেষ্ট)। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কাজকর্মের (এবং তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার) পূর্ণ খবর রাখেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহ শানে-নুযূলে বর্ণিত বিশেষ ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও কোরআনী নির্দেশসমূহ ব্যাপক হয়ে থাকে। এগুলোতে আকায়েদ, ইবাদত, পারস্পরিক লেনদেন ও সামাজিকতার যাবতীয় বিধি-বিধান বিদ্যমান থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও পারস্পরিক কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে এমনি ধরনের কতিপয় বিধান আছে।

গোপন পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ ঃ গোপন পরামর্শ সাধারণত বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে হয়ে থাকে, যাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তারা এই গোপন রহস্য কারও কাছে প্রকাশ করবে না। তাই এরূপ ক্ষেত্রে কারও প্রতি জুলুম করা, কাউকে হত্যা করা, কারও বিষয়-সম্পত্তি অধিকার করা ইত্যাদি বিষয়েরও পরিকল্পনা করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলেছেন যে, আল্লাহ্র জ্ঞান সমগ্র বিশ্বজগতকে পরিবেষ্টিত। তোমরা যেখানে যত আত্মগোপন করেই পরামর্শ কর, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জ্ঞান, শ্রবণ ও দৃষ্টির দিক দিয়ে তোমাদের কাছে থাকেন এবং তোমাদের প্রত্যেক কথা শুনেন, দেখেন ও জানেন। যদি তাতে কোন পাপ কাজ কর, তবে শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে না। এতে বলা উদ্দেশ্য তো এই যে, তোমরা যতই কম বা বেশী মানুষে পরামর্শ ও কানা-কানি কর না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন। উদাহরণস্বরূপ তিন ও পাঁচের সংখ্যা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা তিনজনে পরামর্শ কর, তবে বুঝে নাও যে, চতুর্থ জন আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে বিদ্যমান আছেন। আর যদি পাঁচজনে পরামর্শ কর, তবে ষষ্ঠজন আল্লাহ্ তা'আলা বিদ্যমান আছেন। তিন ও পাঁচের সংখ্যা বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, দলের জন্য আল্লাহ্র কাছে বেজোড় সংখ্যা পছন্দনীয়। مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ আয়াতের সারমর্ম তাই।

কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ ঃ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا

عَنِ النَّجْوٰى—শানে নুযূলের ঘটনায় বলা হয়েছে, ইহুদী ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা চালাতে পারত না। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্তর্নিহিত জিঘাংসা চরিতার্থ করার এক পদ্ধতি তারা আবিষ্কার করেছিল। তা এই যে, তারা যখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে কাউকে কাছে আসতে দেখত, তখন পারস্পরিক কানাকানি ও গোপন পরামর্শের আকারে জটলা সৃষ্টি করত এবং আগন্তুক মুসলমানের দিকে কিছু ইশারা-ইঙ্গিত করত। ফলে আগন্তুক ধারণা করত যে, তার বিরুদ্ধেই কোন ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এতে সে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারত না। রসূলুল্লাহ্ (সা) ইহুদীদেরকে এরূপ কানাকানি করতে নিষেধ করে দেন। نُهُوا عَنِ النَّجْوٰى বাক্যে এই নিষেধাজ্ঞাই বর্ণিত হয়েছে।

এই নিষেধাজ্ঞার ফলে মুসলমানদের জন্যও আইন হয়ে যায় যে, তারাও পরস্পরে এমনভাবে কানাকানি ও পরামর্শ করবে না, যদ্দ্বারা অন্য মুসলমান মানসিক কষ্ট পেতে পারে।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجا رجلان دون الاخر حتى يختلطوا بالناس فان ذالك يحزنه -

অর্থাৎ যেখানে তোমরা তিনজন একত্রিত হও, সেখানে দুইজন তৃতীয় জনকে ছেড়ে পরস্পরে কানাকানি ও গোপন কথাবার্তা বলবে না, যে পর্যন্ত আরও লোক না এসে যায়। কারণ, এতে সে মনঃক্ষুণ্ণ হবে, সে নিজেকে পর বলে ভাববে এবং তার বিরুদ্ধেই কথাবার্তা হচ্ছে বলে সে সন্দেহ করবে।---(মাযহারী)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى -

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদেরকে অবৈধ কানাকানির কারণে হুঁশিয়ার করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব অবস্থা ও কথাবার্তা জানেন, তারা যেন তাদের কানাকানি ও পরামর্শের মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে। এই লক্ষ্য রাখার সাথে তারা যেন চেষ্টা করে যাতে তাদের পরামর্শ ও কানকথার মধ্যে পাপাচার, জুলুম অথবা শরীয়তবিরুদ্ধ কোন প্রসঙ্গ না থাকে; বরং সৎ কাজের জন্যই যেন তারা পরস্পরে পরামর্শ করে।

কাফিররা দুষ্টুমি করলেও নম্র ও ভদ্রসুলভ প্রতিরোধের নির্দেশ ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে

ইহুদী ও মুনাফিকদের এই দুষ্টুমি উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে السلام عليكم বলার পরিবর্তে السام عليكم বলত। سام শব্দের অর্থ মৃত্যু। উচ্চারণে তেমন পার্থক্য না থাকায় মুসলমানদের দৃষ্টিতে তা সহজে ধরা পড়ত না। একদিন হযরত আয়েশা (রা)-র উপস্থিতিতে যখন তারা السام عليكم বলল, তখন হযরত আয়েশা (রা) উত্তরে বললেনঃ السام عليكم ولعنكم الله و غضب عليكم

অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু হোক এবং তোমরা অভিশপ্ত ও আল্লাহ্র গযবে পতিত হও। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে এরূপ জওয়াব দিতে নিষেধ করে বল-লেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীল কথাবার্তা পছন্দ করেন না। তোমার উচিত কটুকথা পরি-হার করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। হযরত আয়েশা (রা) আরয করলেনঃ ইয়া রাসূ-লাল্লাহ্! আপনি কি শুনেন নি ওরা আপনাকে কি বলেছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, শুনেছি এবং এর সমান প্রতিশোধও নিয়েছি। আমি উত্তরে বলেছিঃ عليكم অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও। এটা জানা কথা যে, তাদের দোয়া কবূল হবে না এবং আমার দোয়া কবূল হবে। কাজেই তাদের দুষ্টুমির প্রত্যুত্তর হয়ে গেছে।---(মাযহারী)

মজলিসের কতিপয় শিষ্টাচারঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا মুসলমানদের সাধারণ মজলিসসমূহের বিধান এই যে, কিছু লোক পরে আগমন করলে উপবিষ্টরা তাদের বসার জায়গা করে দেবে এবং চেপে চেপে বসবে। এরূপ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য প্রশস্ততা সৃষ্টি করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এই প্রশস্ততা পরকালে তো প্রকাশ্যই, সাংসারিক জীবিকায় এই প্রশস্ততা হলেও তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এই আয়াতে মজলিসের শিষ্টাচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় নির্দেশ এইঃ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْشُزُوا فَانْشُزُوا—অর্থাৎ যখন তোমাদের কাউকে মজলিস থেকে উঠে যেতে বলা হয়, তখন উঠে যাও। আয়াতে কে বলবে, তার উল্লেখ নেই। তবে সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং আগন্তুক ব্যক্তি নিজের জন্য জায়গা করার উদ্দেশ্যে কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিলে তা জায়েয হবে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ —لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه و لكن تفسحوا و توسعوا

অর্থাৎ একজন অপরজনকে দাঁড় করিয়ে তার জায়গায় বসবে না। বরং তোমরা চেপে বসে আগন্তুকদের জন্য জায়গা করে দাও।---(বুখারী, মুসলিম, মসনদে আহমদ, ইবনে কাসীর)

এ থেকে বোঝা গেল যে, কাউকে তার জায়গা থেকে উঠে যাওয়ার জন্য বলা স্বয়ং আগন্তুকের জন্য জায়েয নয়। কাজেই একথা সভাপতি অথবা সভার ব্যবস্থাপকমণ্ডলী বলতে পারে। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই ঃ যদি সভাপতি অথবা তাঁর নিযুক্ত ব্যবস্থাপক মণ্ডলী কাউকে তার জায়গা থেকে উঠে যেতে বলে, তবে উঠে যাওয়াই মজলিসের শিষ্টাচার। কারণ, মাঝে মাঝে স্বয়ং সভাপতি কোন প্রয়োজনে একান্তে থাকতে চায়; কিংবা বিশেষ লোকদের সাথে গোপন কথা বলতে চায়; কিংবা পরে আগমনকারীদের জন্য একমাত্র ব্যবস্থা এরূপ থাকতে পারে যে, কিছু জানাশোনা লোককে উঠিয়ে দিয়ে আগন্তুকদেরকে সুযোগ দেওয়া। যাদেরকে উঠানো হবে, তারা হয়ত অন্য সময়ও মজলিসে বসে উপকৃত হতে পারবে।

তবে সভাপতি ও ব্যবস্থাপকদের অবশ্য কর্তব্য হবে এমনভাবে উঠে যেতে বলা, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লজ্জিত না হয় এবং তার মনে কষ্ট না লাগে।

যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে, তা এই ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) সুফ্ফা মসজিদে অবস্থানরত ছিলেন। মসজিদ জনাকীর্ণ ছিল। পরে কয়েকজন প্রধান সাহাবী সেখানে আগমন করেন। তাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিধায় অধিক সম্মানের পাত্র ছিলেন। কিন্তু জায়গা না থাকার কারণে বসার সুযোগ পেলেন না। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে সবাইকে চেপে বসে জায়গা করে দেওয়ার আদেশ দিলেন। কোন কোন সাহাবীকে উঠে যেতেও বললেন। যাদেরকে উঠালেন, তারা হয়তো এমন লোক ছিলেন, যারা সর্বক্ষণ মজলিসে হাযির থাকতে পারেন। কাজেই তাদের উঠে যাওয়া তেমন ক্ষতিকর ছিল না। অথবা রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন চেপে বসতে আদেশ করলেন, তখন কেউ কেউ এই আদেশ পালন করেনি। তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মজলিস থেকে উঠে যেতে বললেন।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াত ও উল্লিখিত হাদীস থেকে মজলিসের কয়েকটি শিষ্টাচার জানা গেল। এক. মজলিসে উপস্থিত লোকদের উচিত পরে আগমনকারীদের জন্য জায়গা করে দেওয়া। দুই. যারা পরে আগমন করে, তারা কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিতে পারবে না। তিন. প্রয়োজন মনে করলে সভাপতি কিছু লোককে মজলিস থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন। আরও কতিপয় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরে আগমনকারীরা প্রথম থেকে উপবিষ্ট লোকদের ভেতরে অনুপ্রবেশ না করে শেষ প্রান্তে বসে যাবে। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে তিনজন আগন্তুকের বর্ণনা আছে। তাদের মধ্যে একজন মজলিসে জায়গা না পেয়ে এক প্রান্তে বসে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) তার প্রশংসা করেন।

মাস'আলা ঃ মজলিসের অন্যতম শিষ্টাচার **এই** যে, দুই উপবিষ্ট ব্যক্তির মাঝখানে তাদের অনুমতি ব্যতীত বসা যাবে না। কেননা, তাদের একত্রে বসার মধ্যে কোন বিশেষ উপযোগিতা থাকতে পারে। আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত ওসামা ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لا يحل لرجل ان يفرق

بين اثنين الا باذنهما অর্থাৎ একত্রে উপবিষ্ট দুই ব্যক্তির মধ্যে তাদের অনুমতি ব্যতীত ব্যবধান সৃষ্টি করা তৃতীয় কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয়।—(ইবনে কাসীর)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ — রসূলুল্লাহ্ (সা) জনশিক্ষা ও জন-সংস্কারের কাজে দিবারাত্র মশগুল থাকতেন। সাধারণ মজলিসসমূহে উপস্থিত লোকজন তাঁর অমিয় বাণী শুনে উপকৃত হত। এই সুবাদে কিছু লোক তাঁর সাথে আলাদাভাবে গোপন কথাবার্তা বলতে চাইলে তিনি সময় দিতেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা সময় দেওয়া যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি কষ্টকর ব্যাপার। এতে মুনাফিকদের কিছু দুষ্টুমিও শামিল হয়ে গিয়েছিল। তারা খাঁটি মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে একান্তে গমন ও গোপন কথা বলার সময় চাইত এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা বলত। কিছু অজ্ঞ মুসলমানও স্বভাবগত কারণে কথা লম্বা করে মজলিসকে দীর্ঘায়িত করত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই বোঝা হালকা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে এই আদেশ অবতীর্ণ করলেন যে, যারা রসূলের সাথে একান্তে কানকথা বলতে চায়, তারা প্রথমে কিছু সদকা প্রদান করবে। কোরআনে এই সদকার পরিমাণ বর্ণিত হয়নি। কিন্তু আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আলী (রা) সর্বপ্রথম একে বাস্তবায়িত করেন। তিনি এক দীনার সদকা প্রদান করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে একান্তে কথা বলার সময় নেন।

একমাত্র হযরত আলী (রা) ই আদেশটি বাস্তবায়িত করেন, এরপর তা রহিত হয়ে যায় এবং আর কেউ বাস্তবায়নের সুযোগ পান নি ঃ আশ্চর্যের বিষয়, আদেশটি জারি করার পর খুব শীঘ্রই রহিত করে দেওয়া হয়। কারণ, এর ফলে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেকেই অসুবিধার সম্মুখীন হন। হযরত আলী (রা) প্রায়ই বলতেন ঃ কোরআনে একটি আয়াত এমন আছে, যা আমাকে ছাড়া কেউ বাস্তবায়ন করেনি---আমার পূর্বেও না এবং আমার পরেও কেউ করবে না। পূর্বে বাস্তবায়ন না করার কারণ তো জানা। পরে বাস্তবায়ন না করার কারণ এই যে, আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, আগে সদকা প্রদান করার আলোচ্য আয়াতই সেই আয়াত।---(ইবনে কাসীর)

আদেশটি রহিত হয়ে গেছে ঠিক ; কিন্তু এর ঈপ্সিত লক্ষ্য এভাবে অর্জিত হয়েছে যে, মুসলমানগণ তো আন্তরিক মহব্বতের তাকীদেই এরূপ মজলিস দীর্ঘায়িত করা থেকে বিরত হয়ে গেল এবং মুনাফিকরা যখন দেখল যে, সাধারণ মুসলমানদের কর্মপন্থার বিপরীতে এরূপ করলে তারা চিহ্নিত হয়ে যাবে এবং মুনাফিকী ধরা পড়বে, তখন তারা এ থেকে বিরত হয়ে গেল।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۴﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا

شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً
فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٦﴾ لَّن تُغْنِيَ
عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا
يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾
اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ
حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ
فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾
لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ
اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

(১৪) আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন নি, যারা আল্লাহ্‌র গযবে নিপতিত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও দলভুক্ত নয়। তারা জেনেশুনে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। (১৫) আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করে, খুবই মন্দ। (১৬) তারা তাদের শপথকে ঢাল করে রেখেছে, অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করে, অতএব তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (১৭) আল্লাহ্‌র কবল থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (১৮) যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র সামনে শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে। তারা মনে করবে যে, তারা কিছু সৎপথে আছে। সাবধান, তারাই তো আসল মিথ্যাবাদী। (১৯) শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে

নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্‌র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। (২০) নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত। (২১) আল্লাহ্‌ লিখে দিয়েছেন---আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২২) যারা আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্‌র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন নি (অর্থাৎ মুনাফিকদের প্রতি) যারা আল্লাহ্‌র গযবে নিপতিত (অর্থাৎ ইহুদী ও কাফির) সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? (মুনাফিকরা ইহুদী ছিল, তাই তাদের বন্ধুত্ব ইহুদীদের সাথে এবং কাফিরদের সাথেও সুবিদিত ছিল)। তারা (অর্থাৎ মুনাফিকরা পুরোপুরি) মুসলমানদের দলভুক্ত নয় এবং (পুরোপুরি) তাদের (অর্থাৎ ইহুদীদেরও) দলভুক্ত নয়। (বরং তারা বাহ্যত তোমাদের সাথে আছে এবং বিশ্বাসগতভাবে কাফিরদের সাথে আছে)। তারা মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। (অর্থাৎ শপথ করে বলে যে, তারা মুসলমান; যেমন অন্য আয়াতে আছেঃ وَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ

إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ) এবং নিজেরাও জানে (যে, তারা মিথ্যাবাদী। অতঃপর তাদের শাস্তির কথা বর্ণিত হচ্ছেঃ) আল্লাহ্‌ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (কারণ) নিশ্চিতই তারা যা করে, খুবই মন্দ। (কুফর ও নিফাক থেকে মন্দ কাজ আর কি হবে? এসব মন্দ কাজের মধ্যে একটি মন্দ কাজ এই যে) তারা তাদের (এসব মিথ্যা) শপথকে (আত্মরক্ষার জন্য) ঢাল করে রেখেছে, (যাতে মুসলমান তাদেরকে মুসলমান মনে করে এবং জান ও মালের ক্ষতি না করে) অতঃপর তারা (অন্যদেরকেও) আল্লাহ্‌র পথ (অর্থাৎ ধর্ম) থেকে নিবৃত্ত রাখে (অর্থাৎ বিভ্রান্ত করে); অতএব (এ কারণে) তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (অর্থাৎ শাস্তি যেমন কঠোর হবে; তেমনি অপমানজনকও হবে। যখন এই শাস্তি শুরু হবে, তখন) আল্লাহ্‌র কবল (অর্থাৎ আযাব) থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। (এখানে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, সেই কঠোর ও অপমানজনক শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম)। তারা তাতে চিরকাল থাকবে। (এই শাস্তি সেদিন হবে) যেদিন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সকলকে (অন্যান্য সৃষ্ট জীবসহ) পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র সামনেও

(মিথ্যা) শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে (মুশরিকদের মিথ্যা শপথ কোরআনের এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ) এবং তারা মনে করবে যে, তারা কিছু সৎপথে আছে। (কাজেই মিথ্যা শপথের বদৌলতে বেঁচে থাকে)। সাবধান, ওরাই তো মিথ্যাবাদী। (কারণ, ওরা আল্লাহ্‌র সামনেও মিথ্যা বলতে দ্বিধা করেনি। ওদের উল্লিখিত কর্মকাণ্ডের কারণ এই যে) শয়তান তাদেরকে পুরোপুরি বশীভূত করে নিয়েছে (ফলে তারা এখন শয়তানের কথামতই কাজ করছে) অতঃপর আল্লাহ্‌র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। (অর্থাৎ তারা তাঁর বিধি-বিধান ত্যাগ করে বসেছে। বাস্তবিকই) তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দল অবশ্যই বরবাদ হবে; (পরকালে তো অবশ্যই, মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও। তাদের এই অবস্থা কেন হবে না, তারা তো আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী। নীতি এই যে) যারা আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই (আল্লাহ্‌র কাছে) লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত। (আল্লাহ্‌র কাছে যখন তারা লাঞ্ছিত, তখন উপ-রোক্ত পরিণতি হওয়াই স্বাভাবিক। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য যেমন লাঞ্ছনা অবধারিত করে রেখেছেন, তেমনি অনুগতদের জন্য সম্মান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। কেননা, তারা আল্লাহ্ ও রসূলগণের অনুসারী)। আল্লাহ্ তা'আলা (আদি নির্দেশনামায়) লিখে দিয়েছেন যে, আমি ও আমার রসূলগণ বিজয়ী হব। (এটাই সম্মানের স্বরূপ। এখানে রসূলগণের বিজয় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য; কিন্তু রসূলগণের সম্মানার্থে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকেও জুড়ে দিয়ে-ছেন। সুতরাং রসূলগণ যখন সম্মানিত, তখন তাঁদের অনুসারিগণও সম্মানিত। বিজয়ী হওয়ার অর্থ সূরা মায়েদা ও সূরা মু'মিনে বর্ণিত হয়েছে)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (তাই তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন। অতঃপর কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে মুনাফিকদের বিপরীতে মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) যারা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসে (পুরোপুরি) বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদের (অন্তরকে) শক্তিশালী করেছেন স্বীয় ফয়য দ্বারা ('ফয়য' বলে নূর বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ হিদায়ত অনুযায়ী বাহ্যিক কর্ম এবং অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি। فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ আয়াতে এই নূরই উল্লিখিত হয়েছে। এই নূর অর্থগত জীবনের কারণ। তাই একে রূহ্ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। মু'মিনগণ এই সম্পদ দুনিয়াতে লাভ করবে এবং পরকালে) তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্‌র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হবে; (যেমন অন্য আয়াতে أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ এরপর أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ বলা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم --এসব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেসব লোকের দুরবস্থা ও পরিণামে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আল্লাহ্র শত্রু কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। মুশরিক, ইহুদী, খৃস্টান অথবা অন্য যে-কোন প্রকার কাফিরের সাথে কোন মুসলমানের বন্ধুত্ব রাখা জায়েয নয়। এটা যুক্তিগতভাবে সম্ভবপরও নয়। কেননা, মু'মিনের আসল সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ্র মহব্বত। কাফির আল্লাহ্র দুশমন। যার অন্তরে কারও প্রতি সত্যিকার মহব্বত ও বন্ধুত্ব আছে, তার শত্রুর প্রতিও মহব্বত ও বন্ধুত্ব রাখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এ কারণেই কোরআন পাকের অনেক আয়াতে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে এবং যে মুসলমান কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখে, তাকে কাফিরদেরই দলভুক্ত মনে করার শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এসব বিধি-বিধান আন্তরিক বন্ধুত্বের সাথে সম্পৃক্ত।

কাফিরদের সাথে সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, অনুগ্রহ, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান করা বন্ধুত্বের অর্থের মধ্যে দাখিল নয়। এগুলো কাফিরদের সাথেও করা জায়েয। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের প্রকাশ্য কাজ-কারবার এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে এসব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা জরুরী যে, এগুলো যেন নিজ ধর্মের জন্য ক্ষতিকর না হয়, ঈমান ও আমলে শৈথিল্য সৃষ্টি না করে এবং অন্য মুসলমানদের জন্যও ক্ষতিকর না হয়।

وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ — কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এই আয়াত আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবতাল মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের সাথে বসা ছিলেন, এমন সময় তিনি বললেন ঃ এখন তোমাদের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করবে। তার অন্তর নিষ্ঠুর এবং সে শয়তানের চোখে দেখে। এর কিছুক্ষণ পরই আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবতাল আগমন করল। তার চক্ষু ছিল নীলাভ ; দেহাবয়ব বেঁটে, গোধূম বর্ণ এবং সে ছিল হাল্কা শ্মশ্রুমণ্ডিত। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন ঃ তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দেয় কেন ? সে শপথ করে বলল ঃ আমি এরূপ করিনি। এরপর সে তার সঙ্গীদেরকেও ডেকে আনল এবং তারাও মিছেমিছি শপথ করল। আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে দিয়েছেন।--(কুরতুবী)

মুসলমানের আন্তরিক বন্ধুত্ব কাফিরের সাথে হতে পারে না ঃ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ الآية প্রথম আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বকারীদের প্রতি আল্লাহ্র গযব ও কঠোর শাস্তির বর্ণনা ছিল। এই আয়াতে তাদের বিপরীতে খাঁটি মুসলমানদের

অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র শত্রু অর্থাৎ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও আন্তরিক সম্পর্ক রাখে না, যদিও সেই কাফির তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা নিকটাত্মীয়ও হয়।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) সবারই এই অবস্থা ছিল। এ স্থলে তফসীরবিদগণ অনেক সাহাবীর এমন ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রমুখের মুখ থেকে ইসলাম অথবা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে কোন কথা শুনে সম্পর্কছেদ করে দিয়েছেন, তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন এবং কতককে হত্যাও করেছেন।

একবার সাহাবী আবদুল্লাহ (রা)-র সামনে তাঁর মুনাফিক পিতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করল। তিনি তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এসে পিতাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন না। একবার হযরত আবূ বকর (রা)-এর সামনে তাঁর পিতা আবূ কোহাফা রসূলে করীম (সা) সম্পর্কে কিছু ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করলে দয়ার প্রতীক হযরত আবূ বকর (রা) ক্রোধান্ধ হয়ে পিতাকে সজোরে চপেটাঘাত করেন। ফলে আবূ কোহাফা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। খবর শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ভবিষ্যতে এরূপ করো না। হযরত আবূ ওবায়দা (রা)-র পিতা জাররাহ্ ওহুদ যুদ্ধে কাফিরদের সঙ্গী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সে বারবার হযরত আবূ ওবায়দা (রা)-র সামনে আসত কিন্তু তিনি এড়িয়ে যেতেন। এরপরও যখন সে নিবৃত্ত হল না এবং পুত্রকে হত্যা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখল, তখন হযরত আবূ ওবায়দা (রা) বাধ্য হয়ে পিতাকে হত্যা করলেন। সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক এ ধরনের আরও অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।---(কুরতুবী)

মাস'আলা ঃ পাপাসক্ত ফাসিক-ফাজির ও কার্যত ধর্মবিমুখ মুসলমানদের বেলায়ও অনেক ফিকহ্বিদ এই বিধান রেখেছেন যে, তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয হতে পারে না। কাজকর্মের প্রয়োজনে সহযোগিতা অথবা প্রয়োজন মাফিক সাহচর্য ভিন্ন কথা, যার মধ্যে ফিস্ক তথা পাপাসক্তির বীজাণু বিদ্যমান আছে, একমাত্র তার অন্তরেই কোন ফাসিক ও পাপাসক্তের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থাকতে পারে। তাই রসূলে করীম (সা) তাঁর দোয়ায় বলতেন ঃ اللهم لا تجعل لفاجر على يدا অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাকে কোন পাপাসক্ত ব্যক্তির কাছে ঋণী করো না। অর্থাৎ তার কোন অনুগ্রহ যেন আমার উপর না থাকে। কেননা, সম্ভ্রান্ত মানুষ স্বভাবগত গুণের কারণে অনুগ্রহকারীর প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখতে বাধ্য হয়। কাজেই ফাসিকদের অনুগ্রহ কবূল করা তাদের প্রতি মহব্বতের সেতু। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই সেতু নির্মাণ থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।---(কুরতুবী)

وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ---এখানে কেউ কেউ রূহ্-এর তফসীর করেছেন নূর, যা মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়। এই নূরই তার সৎকর্ম ও আন্তরিক প্রশান্তির উপায় হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এই প্রশান্তি একটি বিরাট শক্তি। আবার কেউ কেউ রূহ্-এর তফসীর করেছেন কোরআন ও কোরআনের প্রমাণাদি। কারণ, এটাই মু'মিনের আসল শক্তি।---(কুরতুবী)